শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২. তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই (وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

তার সদৃশ কোনো কিছুই নেই - ২

আশায়েরা এবং মুতাযেলারা আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাতগুলোকে বুঝতে ভুল করেছে। তাদের ভুলের কারণ হলো, সাধারণ অর্থবোধক শব্দ যে অর্থ বহন করে তা দ্বারা নামকরণকৃত একাধিক বস্তুর মধ্যে সে সাধারণ অর্থ হুবহু বিদ্যমান থাকার ধারণা করেই তারা ভুল করেছে। মূলতঃ বিষয়টি এ রকম নয়। সাধারণ ও যৌথ অর্থবোধক শব্দ দ্বারা একাধিক বস্তুর নাম রাখলে মস্তিস্ক ও মনের কল্পনার মধ্যেই কেবল সবগুলো বস্তুর মধ্যে সে সাধারণ অর্থ হুবহু এবং অভিন্ন অবস্থায় বিদ্যমান থাকার ধারণা জাগ্রত হয়। বাস্তবে উক্ত যৌথ ও সমার্থবোধক নামের প্রত্যেকটিতেই আলাদা আলাদা স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সুতরাং موجود (অস্তিত্বশীল), الحي (চিরঞ্জীব), العليم (জ্ঞানবান) এবং القادر (ক্ষমতাবান) শব্দগুলো দ্বারা যখন আল্লাহ তা'আলার নাম রাখা হবে, তখন তার অর্থ কেবল তার জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হবে। আর যখন বান্দার জন্য ঐ সকল নাম নির্ধারণ করা হবে, তখন তা থেকে কেবল বান্দার জন্য শোভনীয় নির্দিষ্ট অর্থই সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্ব, হায়াত এত ব্যাপক ও বিশাল যে, তাতে অন্য কেউ শরীক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। শুধু তাই নয়; বরং অস্তিত্বশীল নির্দিষ্ট বস্তুর অস্তিত্বেও অন্য কেউ অংশীদার হয় না।[1] সুতরাং স্রষ্টার অস্তিত্বের সাথে সৃষ্টির অস্তিত্বের তুলনা হয় কিভাবে? অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়, এটিই হলো ঐটি। অথচ উভয় বস্তুর বিশেষত্ব, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে বিরাট পার্থক্য থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে পরিস্কার হয়ে গেল যে, যেসব নাম ও বিশেষণ আল্লাহ এবং বান্দার জন্য যৌথভাবে ব্যবহৃত হয়, তা থেকে মুশাবেবহা সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলাকে বান্দার জন্য সাব্যস্ত অর্থে বিশেষিত করেছে। কিন্তু তারা হকের সাথে বাতিল যুক্ত করে বিভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতকে হুবহু বান্দার সিফাত বলেছে এবং আল্লাহকে বান্দার সাথে সাদৃশ্য করে ফেলেছে। অপর দিকে মুআত্তিলা সম্প্রদায় বান্দার সাদৃশ্য হতে আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র করেছে ঠিকই, তবে তারা এ সত্যটি সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য হওয়ার ভয়ে তার সমস্ত সুউচ্চ সিফাতকেই অস্বীকার করে ফেলেছে।

আল্লাহ তা'আলার কিতাব তার অতি সুন্দর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে কেবল এমন সত্য বিষয় উপস্থাপন করেছে, যা মানুষের সুস্থ ও পরিশুদ্ধ বিবেক-বোধশক্তির পক্ষে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। কুরআন এমন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে, যাতে কোনো প্রকার বিকৃতি ও বিচ্যুতি নেই।

সৃষ্টির সাদৃশ্য হয়ে যাওয়া থেকে আল্লাহকে পবিত্র করতে গিয়ে জাহমীয়া সম্প্রদায় খুব সুন্দর কথা বলেছে। কিন্তু একই সময় আল্লাহ তা'আলার জন্য যেসব সুউচ্চ অতুলনীয় গুণাবলী তারা সাব্যস্ত করে তা অস্বীকার করে খুব নিকৃষ্ট কাজ করেছে।

অপরদিকে মুশাবেবহা সম্প্রদায় আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সুন্দর কথা বলেছে। কিন্তু আল্লাহর সিফাতকে হুবহু বান্দার সিফাতের সাথে তুলনা করে খুব নিকৃষ্ট কাজ করেছে।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে অনারব লোকের জন্য যে অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়, সম্বোধিত ব্যক্তি ঐ অর্থ ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারে না, যতক্ষণ না সে শব্দটি দ্বারা মূল জিনিসটি চিনতে পারে। যে শব্দ একাধিক বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়, ঐ শব্দের মূল অর্থে সবগুলো বস্তুই শরীক থাকে। অর্থাৎ শব্দটির অর্থের একটি যৌথ্য পরিমাণ ও সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ সবগুলো বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। এ পরিমাণ যৌথ ও সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ না থাকলে শ্রোতাদেরকে কখনো সম্বোধন বুঝানো যাবে না। এমনকি বাক্যের অর্থ শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একক শব্দের অর্থ শেখাতে হয়।

শিশুকে ভাষা শিক্ষা দেয়ার সময় সর্বপ্রথম তার সামনে শব্দ উচ্চারণ করা হয় এবং তার অর্থটি প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয় শক্তির সামনে সুস্পষ্ট হলে ইঙ্গিতের মাধ্যমে শিশুকে অর্থটি দেখিয়ে দিতে হয়। যেমন তাকে বলা হয়, لبن (দুধ), خبز (রুটি), أم (মা), أب (বাপ), سماء (আকাশ), أرض (যমীন), شمس (সূর্য), قمر (চাঁদ), ماء (পানি) ইত্যাদি। এ নামগুলো দ্বারা যা উদ্দেশ্য হয়, তার প্রত্যেকটি শিশুকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝানো হয়ে থাকে। তা করা না হলে শব্দের অর্থ এবং শিক্ষকের উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। শ্রবণ শক্তি দ্বারা অর্জিত শিক্ষা প্রত্যেক বনী আদমেরই প্রয়োজন রয়েছে। আর কেনইবা তা প্রয়োজন হবে না?

অথচ আবুল বাশার আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম ঐসব জিনিসগুলো শেখালেন, যা শ্রবণ শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায়। অর্থাৎ সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন। আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথা বলেছেন এবং অহীর মাধ্যমে এমন জিনিস শিখিয়েছেন, যা তিনি বোধশক্তির মাধ্যমে জানতে পারেননি।

মানুষ মনের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে। মানুষের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য মনের মধ্যেই লুকায়িত থাকে। প্রথমে শব্দের মাধ্যমে তা বুঝা যায় না। শব্দের মাধ্যমে কোন অর্থ উদ্দেশ্য করা হচ্ছে, তা সর্বপ্রথম জানা ব্যতীত শব্দের নিছক উচ্চারণের মাধ্যমে অর্থ বুঝা যায় না। যখন তা জানা যায়, অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার শব্দটি শ্রবণ করে, তখন ইঙ্গিত ছাড়াই উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায়

আর শব্দের দ্বারা যদি এমন বিষয় উদ্দেশ্য হয়, যা ভিতরে অনুভব হয়, যেমন ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, তৃষ্ণা নিবারণ, দুঃশ্চিন্তা, খুশী ইত্যাদি, এগুলোর নাম ও স্বরূপ কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের মধ্যে তা অনুভব করে। সে যখন তা নিজের মধ্যে অনুভব করবে, তখন তাকে ইঙ্গিত করে বুঝানো হবে এবং বলা হবে যে, এগুলোই হলো ক্ষুধা, তৃপ্তি, পিপাসা ইত্যাদির নাম। ইঙ্গিত কখনো নিজের ক্ষুধা অথবা পিপাসার দিকে হতে পারে। যেমন কেউ কাউকে ক্ষুধার্ত দেখে বলল, তুমি ক্ষুধার্ত হয়েছো, তুমি ক্ষুধার্ত ইত্যাদি। শিশুকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রেও শিশুর মা একই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। শিশু তার মার জবানে উচ্চারিত শব্দ শুনে এবং ইঙ্গিতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়টিও বুঝে নেয়। অথবা ইঙ্গিতের অর্থ প্রদানকারী এমন আলামত ব্যবহার করে, যা দ্বারা উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়। শিশু যখন তার নিজের মধ্যে ক্ষুধা অথবা পিপাসা অনুভব করে তখন তার অবস্থা দেখে শিশুর মা বলে তুমি ক্ষুধার্ত, এ বলে তার মা তার জন্য খাবার অথবা দুধ বাড়িয়ে দেয় এবং খাবার পরিবেশন করার সময় الطعام এবং পানি দেয়ার সময় الماء ইত্যাদি উচ্চারণ করে। প্রত্যেকবারই এ কাজের পুনরাবৃত্তি হওয়া এবং তার মা কর্তৃক খাবার কিংবা পানীয় পরিবেশন করা থেকে শিশুর মাথায় বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ক্ষুধার সময় যা গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় الطعام (খাবার) এবং পিপাসা লাগলে যার প্রয়োজন তার নাম الماء (পানি)। মায়ের এহেন কথা-বার্তা ও ইঙ্গিত থেকেই শিশু الجوع এবং العطش শব্দের অর্থ বুঝে নেয়। শিশু বুঝে নেয়, তার ভিতরে খাবারের যে প্রয়োজন অনুভব হয় তার নাম الجوع (ক্ষুধা) এবং তার ভিতরে পানির যে

প্রয়োজন অনুভব হয়, তার নাম العطش (পিপাসা)। এভাবেই শিশু ইঙ্গিত ছাড়াই শব্দ এবং তার অর্থ বুঝে নেয়। এগুলো বোধশক্তি দ্বারা অনুভূত অভ্যন্তরীন বিষয়। শিশু যখন কাউকে বিষন্ন দেখে তখন যদি তার পিতা বলে هذا غضبان ‘‘এ লোকটি ক্রোধান্বিত’’ এবং শিশু যদি কোনো মানুষের মধ্যে হাশি-খুশীর লক্ষণ দেখে এবং শিশুর পিতা যদি বলে هذا فرح ‘‘এ লোকটি আনন্দিত, তা থেকে শিশুরা غضبان এবং فرح ـ এর অর্থ বুঝে নেয়।

ঠিক এমনি শিশু যখন অন্যদেরকে উক্ত শব্দগুলো দ্বারা তাদের নিজ নিজ অবস্থা তুলে ধরে তখনো শিশুরা শব্দ এবং তার অর্থ বুঝে নেয়।

উপরোক্ত বিশেষণের উদ্দেশ্য হলো, নাবী-রসূলগণ তাদের জাতির লোকদের সামনে যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর একাধিক অবস্থা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যা তাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও সাক্ষ্য-প্রমাণ অথবা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য হতে পারতো। আরেক শ্রেণীর বিষয় ছিল যা ইন্দ্রিয় কিংবা সাক্ষ্য-প্রমাণ অথবা বোধশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না। জিনিসগুলো প্রথম দু‘প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলে তা বুঝতে ভাষাজ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। একক শব্দগুলো এবং বাক্যের অর্থ বুঝে নিলেই তা বুঝা সম্ভব। যখন তাদেরকে বলা হয়েছে,

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ

‘‘আমি কি তাকে দু’টি চোখ, একটি জিহবা ও দু’টি ঠোঁট দেইনি’’। (সূরা আল বালাদ: ৮-৯) অথবা যখন তাদেরকে বলা হয়েছে,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

‘‘আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদেরকে বের করেছেন এএ অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন এবং হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো’’। (সূরা আন নাহাল: ৭৮)

অনুরূপ আয়াত আরো অনেক রয়েছে। এ আয়াতগুলোতে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সম্বোধিত ব্যক্তিগণ তা ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝে নিয়েছে।

আর যেসব বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় না, কিংবা চোখ দ্বারা দেখা যায় না এবং সাধারণ বিবেক-বোধশক্তি দ্বারা যা অর্জন করা অসম্ভব হওয়ার কারণে শব্দের মাধ্যমে যার উদ্দেশ্য বুঝা যায় না; বরং তা এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না, সেক্ষেত্রে কথা হলো তা বুঝার জন্য কিয়াস-তুলনা এবং উদাহরণ উপস্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। সে সাথে ঐ বিষয়গুলো এবং বোধশক্তি দ্বারা বোধগম্য দৃশ্যমান বস্তুগুলোর মধ্যে যে সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রয়েছে তার মধ্যে বিচার-বিবেচনা করা জরুরী। এক্ষেত্রে উপমা ও দৃষ্টান্ত যত বেশী শক্তিশালী হয়েছে, বর্ণনা ততই সুন্দর হয়েছে এবং বিষয়গুলো অধিকতর পূর্ণরূপে বুঝা সম্ভব হয়েছে।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য এমনসব বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা ইতিপূর্বে পরিচিত ছিল না। আরবদের ভাষায় এমন কোন শব্দও ছিল না, যা দ্বারা হুবহু ঐ জিনিসগুলো বুঝা যায়। তাই তিনি এমনসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থের সাথে আরবদের ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থের মিল রয়েছে। এ শব্দগুলোকেই নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ের নাম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আরবরা যে অর্থে ঐ

শব্দগুলো ব্যবহার করতো এবং নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐগুলোকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, উভয়ের মাঝে একটি যৌথ অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ছলাত, যাকাত, সিয়াম, ঈমান, কুফর ইত্যাদি। আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আখেরাত সম্পর্কীয় বিষয়াদির কথাও অনুরূপ।

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অর্থে এ পরিভাষাগুলো ব্যবহার করেছেন, ইসলাম আগমনের পূর্বে তাদের নিকট সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।[2] এজন্য হুবহু এ অর্থগুলো প্রকাশকারী শব্দমালাও তাদের নিকট ছিল না। তাই নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবী ভাষা থেকে ইসলামী বিষয়গুলো লোকদের বুঝানোর জন্য এমন উপযুক্ত শব্দমালা ব্যবহার করেছেন, যাতে আরবদের নিকট পরিচিত অর্থ এবং রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আনীত গায়েবী অর্থের মধ্যে সম্পর্ক ও মিল ছিল। এর সাথে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসল উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য বিভিন্ন ইঙ্গিত এবং অনুরূপ বিষয় যোগ করেছেন। যেমন ইঙ্গিতের মাধ্যমে শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। রাবীআ বিন আবু আব্দুর রাহমান বলেন, জ্ঞানীদের কাছে শিক্ষার্থীগণ ঠিক সেরকম যেমন পিতা-মাতার কোলে শিশুগণ।

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব গায়েবী বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, তার অনুরূপ কিছু বিষয় তারা তাদের ইন্দ্রিয় এবং বোধশক্তি দ্বারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন তিনি মক্কার লোকদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আদ জাতি প্রচন্ড বাতাসের মাধ্যমে ধ্বংস হয়েছে। আদ জাতি ছিল তাদের মতই মানুষ, আর তারা যে বাতাসে ধ্বংস হয়েছিল, তা ছিল তাদের কাছে পরিচিত বাতাসের মতই। তবে তা ছিল অধিকতর প্রচন্ড ও শক্তিশালী। সাগরে ফেরাউনের ডুবে মরার ঘটনাও অনুরূপ। অতীত জাতিসমূহের সংবাদের ব্যাপারেও একই কথা। এ জন্যই আমাদের জন্য পূর্বের জাতিসমূহের ঘটনা বর্ণনা করার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

‘‘পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে’’। (সূরা ইউসুফ: ১১১)

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এমন বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, সার্বিক বিবেচনায় যার অনুরূপ হাকীকত বিশিষ্ট জিনিস তারা কখনো দেখেনি। তবে তিনি যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অর্থের মধ্যে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা তাদের ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের মধ্যে কোনো না কোনো দিক বিবেচনায় সাদৃশ্য রয়েছে।

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি ঈমান এবং অন্যান্য গায়েবী বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তখন তাদের জানা আবশ্যক ছিল যে, তিনি যেসব শব্দের মাধ্যমে গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন তার মাঝে এবং ঐ সমস্ত শব্দ দ্বারা তারা দুনিয়াতে তাদের ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তি দ্বারা বুঝতো তার মাঝে অর্থগত একটা মিল ও সংগতি থাকবে।[3]

আর যখন এমন হতো যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবী বিষয়সমূহের যেসব শব্দ বলেছেন, তার অর্থ তারা তখনো দুনিয়াতে প্রত্যক্ষ করেনি; বরং তিনি তাদেরকে তা পূর্ণরূপে দেখাতে চাচ্ছেন, যাতে তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও গায়েবী বিষয়ের মধ্যকার যৌথ অর্থটি বুঝতে পারে, তখন তিনি তাদেরকে ঐ জিনিসটি দেখিয়েছেন, তাদের বুঝানোর জন্য তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং সে ব্যাপারে এমন কথা বলেছেন, যা তার জন্য বর্ণনা ও সাদৃশ্য স্বরূপ হয়। এতে করে শ্রোতাগণ বুঝে নিতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান হাকীকতগুলোর জ্ঞান হাসিল করাই হলো গায়েবী বিষয়সমূহ জানার একমাত্র পন্থা।

সুতরাং নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য পুরোপুরি বুঝার জন্য তিনটি বিষয় জানা আবশ্যক।

(১) তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন তার বিষয়বস্তু যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃশ্যমান হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ ভালোভাবে আয়ত্ত করা।

(২) বোধশক্তি দ্বারা তার সাধারণ অর্থ উপলব্ধি করা।

(৩) ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তির দ্বারা উপলব্দিযোগ্য অর্থসমূহের প্রতি নির্দেশক শব্দগুলোর অর্থ সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করা।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি সম্বোধন বুঝার জন্য এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। তিনি যেখানে আমাদেরকে গায়েবী বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, সেখানে গায়েবী বিষয় ও বাস্তব বিষয়ের মধ্যকার যৌথ অর্থ এবং উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য সম্পর্কে আমাদের জানা আবশ্যক। দুনিয়ার পরিচিত ও দৃশ্যমান বস্তুগুলো আমরা না বুঝলে গায়েবী বিষয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য করা সম্ভব হতো না।

আর গায়েবী বিষয়গুলো দুনিয়ার পরিচিত বিষয়ের অনুরূপ হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন আমরা ইতিপূর্বে বাতাসের মাধ্যমে আদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছি। আর অনুরূপ ও সাদৃশ্যপূর্ণ না হলে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বলা হবে। এভাবে বলা হবে যে, ঐ বিষয়টি এরূপ নয় এবং এ জাতিয় অন্যান্য কথা।[4]

সুতরাং যখন সাব্যস্ত হলো যে, গায়েবী বিষয় ও দুনিয়ার পরিচিত জিনিসগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য নেই, তখন সম্বোধনের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য করাই যথেষ্ট।[5]

তবে এটি জেনে রাখা আবশ্যক যে, উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকা উভয়ের মধ্যে একটি যৌথ অর্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। এ যৌথ পরিমাণই হলো لفظ مشترك তথা যৌথ শব্দের অর্থ।

গায়েবী বিষয় এবং দুনিয়ার পরিচিত বিষয়ের মধ্যে এ পরিমাণ মিল রয়েছে বলেই আমরা গায়েবী বিষয়গুলো বোধশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এ পরিমাণ মিল না থাকলে আমাদের পক্ষে তা বুঝা সম্ভব হতো না।

ফুটনোট

[1]. অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্ব এমন নয় যে, এক সময় তার অস্তিত্ব ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করেছেন। বরং তিনি সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার আগেও ছিলেন, সৃষ্টি করার পরেও আছেন, আগামীতেও থাকবেন। কিন্তু বান্দার অস্তিত্ব এক সময় ছিল না। অতঃপর সে অস্তিত্বে এসেছে এবং তার অস্তিত্ব চিরন্তনও নয়। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টিই ধবংসশীল। সুতরাং বান্দার অস্তিত্ব এবং আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তেমনি বান্দার কিছু কিছু সিফাত এবং আল্লাহর কিছু কিছু সিফাতের নাম এক হলেও উভয়ের সিফাতের পরিমাণ ও ধরণের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

[2]. তবে তারা এ শব্দগুলো অন্যান্য অর্থে তাদের কথা-বার্তায় ব্যবহার করতো। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তার মাঝে এবং তৎকালীন আরবের লোকেরা যে অর্থে ঐগুলোকে ব্যবহার করতো, তার মাঝে একটা মিল অবশ্যই রয়েছে। তারা রুকু-সিজদা বিশিষ্ট ছলাতের সাথে পরিচিত ছিল না। কিন্তু তারা এটি বুঝতো যে, الصلاة অর্থ দু‘আ, الزكاة অর্থ পবিত্র হওয়া ইত্যাদি। ইসলামের ছলাতের মধ্যে

যেহেতু রুকু-সিজদা-কিয়ামের সাথে প্রচুর দু‘আর সমাহার ঘটেছে, তাই এটিকে ছলাত নাম দেয়া হয়েছে। এমনি যাকাতের মধ্যে যেহেতু ব্যক্তি ও ব্যক্তির মাল-ধনের পবিত্রতা রয়েছে, তাই সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদের বিশেষ যে অংশ বছরে একবার গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয় তাকে যাকাত বলা হয়েছে। আমরা الصيام বলতে ইসলামের যে রোযাকে বুঝি, আরবের লোকেরা তখন সে অর্থে সিয়ামকে বুঝতো না। আমরা নিয়তসহ সুবহে সাদেকের একটু পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং রোযা ভঙ্গকারীর অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকাকে সিয়াম বলি। কিন্তু তারা বিরত থাকা অর্থে সিয়াম শব্দটি তাদের ভাষায় ব্যবহার করতো। ইসলামের পারিভাষিক অর্থ আর তাদের ব্যবহৃত অর্থ যদিও হুবহু এক নয়, কিন্তু উভয় অর্থের মধ্যে মৌলিক মিল রয়েছে। এ মিল না থাকলে কুরআন ও হাদীছের শব্দগুলো বুঝা মোটেই সম্ভব হতো না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের বিভিন্ন পরিভাষার জন্য যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে সময়ের আরবরাও তা ব্যবহার করতো। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, আরবরা হুবহু সে অর্থের সাথে পরিচিত ছিল না ঠিকই; কিন্তু সেগুলোর সাধারণ ও মূল অর্থ তাদের কাছে পরিচিত ছিল। শব্দগুলো দ্বারা তিনি অতিরিক্ত কী উদ্দেশ্য করেছেন, তা কথা-বার্তা, উপমা-উদাহরণ, কাজ-কর্ম, ইঙ্গিত-ইশারা এবং বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গায়েবী বিষয়ের ক্ষেত্রেও যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাও আরবরা ব্যবহার করতো। তারা যে অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করতো, তা ঠিক রেখে অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থ গায়েবী বিষয়ের শব্দগুলো বহন করে, তা বুঝ শক্তির নিকটবর্তী করার জন্য কুরআন ও হাদীছে বহু দৃষ্টান্ত, উপমা, ইশারা-ইঙ্গিত পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐগুলোর চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ পেশ করেছেন। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[3]. উদাহরণ স্বরূপ কিয়ামতের দিন মানুষের আমল ওজন করার জন্য স্থাপিত দাঁড়িপাল্লা, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে স্থাপিত পুলসিরাত, হাওযে কাউছার, আমলনামা ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। যে অর্থে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সে অর্থ তাদের কাছে পরিচিত ছিল না। কিন্তু এগুলোর মূল অর্থ তাদের জানা ছিল। তাদের কাছে জিনিস-পত্র ওজন করা ও মাপার দাঁড়িপাল্লা ছিল এবং তারা পানির হাওয দেখেছে। অনুরূপ জান্নাতের যেসব ফল-ফলাদির উল্লেখ রয়েছে, তার অনুরূপ বিভিন্ন ফলও তারা দুনিয়াতে দেখেছে ও খেয়েছে। এসব জিনিসের দুনিয়ার এবং আখেরাতের নাম এক ও অভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে অর্থগত একটা মিল ও সাদৃশ্য হয়েছে। এ পরিমাণ মিল না থাকলে গায়েবী বিষয়ে নাবী-রসূলদের সম্বোধন তাদের বোধগম্য হতো না। কিন্তু পরিমাণ ও গুণাগুণের দিক থেকে দুনিয়া এবং আখেরাতের গায়েবী বিষয়সমূহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহর সিফাতগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা। এগুলোও গায়েবী বিষয়। কুরআন ও হাদীছে আরশের উপর আল্লাহ তা‘আলার সমুন্নত হওয়া, তার ইলম, হায়াত, কুদরত, দেখা, শ্রবণ করা, হাত, পা, চোখ ইত্যাদি বিশেষণের কথা বলা হয়েছে। আখেরাতের বিভিন্ন গায়েবী বিষয় এবং আল্লাহর বিভিন্ন সিফাত একই সূত্রে গাথা। জান্নাত মানে বাগান। নার মানে আগুন। দুনিয়ার বাগানকে জান্নাত বলা হয়। আখেরাতের মুমিনদের জন্যও রয়েছে জান্নাত। দুনিয়ার আগুন ও আখেরাতের আগুনের মূল অর্থ একই। কিন্তু উভয়ের গুণাগুণ, উত্তাপের পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা।

সুতরাং কোন বিশেষণ দ্বারা একাধিক বস্তু বিশেষিত হলেই উক্ত বিশেষণ দ্বারা সকলেই পরিমাণ, গুণাগুণ, পদ্ধতি, ধরণ ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে সমানভাবে বিশেষিত হয়ে যায় না। দুনিয়ার সকল মানুষকে একত্রিত করলেও সকল দিক থেকে সমান বৈশিষ্টের ও একই চেহারার মানুষ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। মাখলুকের ক্ষেত্রে বিষয়টি যখন ঠিক এ রকমই, তখন মহান স্রষ্টার সিফাত এবং নগণ্য সৃষ্টির সিফাত এক হয়ে যায় কিভাবে? মানুষের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীগণ। কিন্তু সকল মানুষের জ্ঞান সমান নয়। কিন্তু জ্ঞানের মূল অর্থ তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। সকল সৃষ্টির হাত যেখানে এক রকম নয়, সেখানে আল্লাহর হাত মানুষের হাতের অনুরূপ হওয়ার ধারণা মাথায় আসে কিভাবে?

মোট কথা গায়েবী-অদৃশ্য বিষয়গুলো নাবী-রসূলগণ তাদের নিজ নিজ জাতির কাছে এমনসব শব্দ দ্বারা উপস্থাপন করেছেন, সেসব শব্দের অর্থ তাদের কাছে পরিচিত ছিল বলেই তারা বোধশক্তি কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝে নিত। আল্লাহর হাত বলতে তারা হাতই বুঝতো। অর্থাৎ ইহার মূল অর্থ সৃষ্টি এবং স্রষ্টা উভয়ের জন্যই সাব্যস্ত, -এটা তাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হতো না। কিন্তু কখনো তারা এ থেকে তাশবীহ অর্থাৎ আল্লাহর হাতের সাথে বান্দার হাতের সাদৃশ্য বুঝতো না। বিশেষ করে যখন তারা ইন্দ্রিয় ও বোধশক্তি দ্বারা একাধিক মাখলুককে একই সিফাত দ্বারা সকল দিক বিবেচনায় সমানভাবে বিশেষিত হতে দেখেনি। তাই ছাহাবীদের যুগে আল্লাহর সিফাতসমূহ বুঝতে তাদের কোন অসুবিধা হয়নি। অর্থাৎ তারা সহজেই বুঝে নিয়েছেন যে, আল্লাহর কোনো সিফাতই বান্দার সিফাতের মত নয়। (আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[4]. আল্লাহ তা‘আলার সিফাত মাখলুকের সিফাতের অনুরূপ ও সদৃশ নয় এবং আখেরাতের গায়েবী বিষয়গুলোও দুনিয়ার পরিচিত জিনিসগুলোর সদৃশ নয়।

[5]. উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রথমত যখন কারো প্রতি সম্বোধন না করে শুধু اليد শব্দটি উল্লেখ করা হবে, তখন আমাদের বোধশক্তি মস্তিস্কে হাতের একটি সাধারণ অর্থ কল্পনা করে। এ অর্থের নাম হলো المعنى الكلي العام المشترك অর্থাৎ একাধিক সত্তার জন্য সম্বোধনযোগ্য একটি সাধারণ অর্থ। এটি হতে পারে যেমন আল্লাহর হাত, হতে পারে মানুষের হাত, হতে পারে অন্যান্য প্রাণীর হাত। মন ও মস্তিস্কের মধ্যেই এ যৌথ চিন্তা জাগ্রত হতে পারে। মস্তিস্কের বাইরে এ অর্থে এমন কোনো হাত নেই, যা সকলের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যখন হাতকে কারো দিকে সম্বোধন করা হবে, তখন যৌথ অর্থের চিন্তা কিংবা একজনের হাতের সাথে অন্যের হাতের সাদৃশ্যের সন্দেহ ও ধারণা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং যখন يد الله (আল্লাহর হাত), يد الإنسان (মানুষের হাত) يد النملة (পিপড়ার হাত) ইত্যাদি বলা হবে তখন এক জিনিসের হাতের সাথে অন্য জিনিসের হাতের সাদৃশ্যের চিন্তা বাতিল হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেকের জন্য শোভনীয় হাতের ধারণা মাথায় চলে আসে। অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব, মর্যাদা ও সম্মানের সাথে যেমন হাত শোভনীয়, তেমনি তার হাত। আমরা তার ধরণ, কায়া, পরিমাণ ইত্যাদি জানি না। কারণ সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয়নি। ঐদিকে আমরা মানুষের হাত দেখেছি। সুস্থ ও স্বাভাবিক গঠনের একজন মানুষের হাত কেমন হতে পারে তাও আমরা দেখি। যদিও সকলের চেহারা, গঠন, ধরণ, শক্তি এক রকম নয়। এটি একদম সহজ-সরল ও বোধগম্য কথা। এটিই বাস্তব কথা। বিবেকবান ও সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী কোন মানুষ কি কখনো বলেছে হাতির পা পিপড়ার পা-এর মত?

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে সুপ্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত হচ্ছে যে, সকল সৃষ্টির বিশেষণ, বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব যেখানে এক রকম নয়, সেখানে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার জন্য হাত বা অন্যান্য সিফাত সাব্যস্ত করলে যাদের বিবেক ও বোধশক্তির নিকট আল্লাহর হাত বান্দার হাতের মত মনে হয় কিংবা মানুষের অঙ্গের মতই যারা হাতকে কল্পনা করে তাদেরকে বিবেকবান, যুক্তিবিদ ও বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে না।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8873

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন